Vol. 52 | No. 2 | 2015

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

অদ্বৈত মল্লবর্মণ : ঐতিহ্য ও স্বাদেশিকতার অনুসন্ধান

Volume	52
Issue	2
Year	2015
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Munira Sultana
Published online	February 1, 2015
DOI	10.62328/sp.v52i2.7
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v52i2.7
Pages	১০৭-১১৭
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

অদ্বৈত মল্লবর্মণ : ঐতিহ্য ও স্বাদেশিকতার অনুসন্ধান

Check for updates

মুনিরা সুলতানা*

বিশ শতকের বাংলা উপন্যাসের ধারাকে অদ্বৈত মল্লবর্মণ (১৯১৪-১৯৫১) তাঁর কথাসাহিত্য দ্বারা সমৃদ্ধ করেছেন, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তাঁর প্রথম গ্রন্থ *তিতাস একটি নদীর নাম*-এর মাধ্যমেই এই সাফল্য শুরু হয়েছিল। কল্লোলগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত না হয়েও তিনি সাহিত্যে কল্লোলীয় আদর্শকে ধারণ করেছেন। মিতকথনের শিল্পী অদ্বৈত মল্লবর্মণ। সাংবাদিকতার পেশা তাঁর দৃষ্টিকে নির্মোহ ও অনুসন্ধিৎসু করেছে। তাঁর রচিত সাহিত্যকর্মের মধ্যে রয়েছে *তিতাস একটি নদীর নাম* (১৯৫৬), *শাদা হাওয়া* (১৯৯৬), *রাঙামাটি* (১৯৯৭)। 'সন্তানিকা' (১৯৩৯), 'স্পর্শ দোষ' (১৯৪১), 'বন্দী বিহঙ্গ' (১৯৪৬), 'কান্না' (১৯৯৬) প্রভৃতি ছোটগল্পও লিখেছিলেন তিনি। 'ভারতের চিঠি– পার্ল বাক কে' সাংবাদিক অদ্বৈতের অন্যতম সার্থক রচনা। এটি রিপোর্টাজ ধরনের লেখা। প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৪৩ এর মধ্যেই। পঞ্চাশের মন্বন্তরের চিত্র রয়েছে গ্রন্থটিতে। আছে ২২ জুন ১৯৪১ তারিখে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার 'আচমকা ও আকস্মিক' যোগদান ও তাঁর 'সুদূর প্রসারী' ফলাফলের কথা। অদ্বৈত মল্লবর্মণ বিশ-তিরিশের দশক জুড়ে কবিতাও রচনা করেন। 'তাঁর কবিতায় নজরুল ইসলামের স্বাদেশিকতা ও উদার মানবিকতার প্রভাব পড়েছিল' (সুবোধ ১৯৯৪ : ২৪) বলে মনে করেছেন সমালোচক।[১] লেখক-শিল্পী হিসেবে উঁচুমানের কবিত্ব ও কল্পনাশক্তির প্রাচুর্য লক্ষ করেই ঔপন্যাসিক অদ্বৈতকে মূলত 'কবি' বলে চিহ্নিত করেন সমালোচক। উপন্যাসের বিষয়বস্তুর মতোই তাঁর কবিতার বিষয় মূলত এবং প্রধানত মানুষ ও প্রকৃতি। ১৩৪২ সালে 'ত্রিপুরা লক্ষ্মী'র (কুমিল্লা জেলা থেকে প্রথম ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত পত্রিকা) শ্রাবণ সংখ্যায় 'ত্রিপুরা লক্ষ্মী' নামে অদ্বৈত মল্লবর্মণের একটি কবিতা ছাপা হয়। এ প্রসঙ্গে সমালোচক লেখেন :

> অদ্বৈত মল্লবর্মণ প্রধানত প্রকৃতি ও মানবতাবাদী কবি। তাঁর কবিতায় প্রকৃতি যেমন ভিড় করে দাঁড়ায়, তেমনি মানুষের শোক-দুঃখগাথাও একই কাতারে এসে জড়ো হয়। মানুষের শোক-দুঃখে কবি অস্থিরতা অনুভব করেন। এগুলি তাড়ানোর জন্য লক্ষ্মীর কাছে আকুতি জানান। প্রার্থনা করেন — হাসি-খুশিতে ভরা একটি সুন্দর জীবনের। (তিতাশ, ২০০১ : ১৯)

উল্লেখ্য কবিতার একটি অংশ :

অনশনে, অর্ধাশনে জীর্ণ-শীর্ণ কংকালের মত
রয়েছে পড়িয়া
নাহি মা প্রাণের সাড়া, নাহি উৎসবের ধারা
প্রাণে আছে যেন মরমে মরিয়া।
বুকগুলো ধুকিতেছে, মুখগুলো ব্যথায় মলিন
বলহীন দেহ

*সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

তোর ছেলে দুঃখে মরে তুই না চাহিলে ফিরে
মাগো অন্য কেহ করিবে কি স্নেহ?
সবাই জুড়িছে তর্ক বড় বড় কথা নিয়া হায়
কয় বড় কথা
ছোট ছোট প্রাণগুলো মৃত্যু মোহ তন্দ্রাতে বিলীন,
কে বুঝিবে ব্যথা?
দিন যায় মাস যায় বর্ষ যায় — এক এক কবি
হয় অবসান,
দুঃখ দুর্ভিক্ষের বোঝা দিনে দিনে হয়ে ওঠে ভারি
জ্বলে চিতা দাবাগ্নি সমান।

কবিতার পঙ্‌ক্তিগুলোতে যে ক্ষোভ ও বেদনার শিল্পিত প্রকাশ ঘটেছে, তা *তিতাস একটি নদীর নাম* উপন্যাসের শুরুতেই জীবনের হাসি-কান্নার গভীর দার্শনিক বর্ণনার সমকক্ষ। অর্থাৎ উপন্যাসের ভাবনাবীজের অন্যতম প্রধান সুর কবিতাটি বহন করছে। "তিতাসের বুকে স্তন বসে যাওয়ার মত নিষ্ঠুর বাস্তবতার সঙ্গেও রয়েছে এর সাদৃশ্য অথবা আত্মার বন্ধন।" (শান্তনু, ২০০১ : ৩০)। কবিতাগুলো কেবল রচয়িতার মানবিক বোধকেই প্রমাণ করে তা নয়। সমাজে তথা রাষ্ট্রে বিদ্যমান দ্বন্দ্বকে এর যথাযথ পরিপ্রেক্ষিতে অনুধাবন করে অদ্বৈত যেভাবে তাঁর কথাসাহিত্য রচনা করেছেন, সেই সহজাত দায়বোধ তাঁর কোনো কোনো কবিতাতেও আছে। 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় তিনি চারটি কবিতা 'রক্ত নিশান' শিরোনামে ছাপেন। "ঐ কবিতা চতুষ্টয়ে ব্রিটিশ বিরোধী বক্তব্য থাকায় পত্রিকার ওপর যে ঝঞ্ঝাট নেমে আসে তার দায়িত্ব নিশ্চিতই অদ্বৈত মল্লবর্মণের ওপর বর্তায়। আর যিনি স্কুল জীবনেই অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন, সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সম্পর্কে তাঁর মনোভাব যে কী ছিল তা না বললেও চলে।" (শান্তনু, ১৯৮৭ : ১৪)। অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ বিষয়ে একজন সংঘবদ্ধ রাজনীতিকের মতোই অদ্বৈতের চেতনার গড়ন দেখা যায়। এটা তাঁর নিজস্ব পঠন-পাঠন থেকে যেমন অর্জিত তেমনি ব্যক্তি-গোষ্ঠী ও সমাজ জীবনবৃত্তের অন্তর্বীক্ষা থেকেও অনুপ্রাণিত।

অদ্বৈত মল্লবর্মণের প্রবন্ধ-নিবন্ধের সংখ্যাও কম নয়। এগুলোর অধিকাংশ লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্য বিষয়ক। প্রবন্ধগুলোর বেশিরভাগ মাসিক 'নবশক্তি' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর প্রবন্ধ-নিবন্ধের মধ্যে আছে — ১. দুটি বারমাসী গান (১৯৩৬) ২. ত্রিপুরার একটি বারমাসী গান (১৯৩৬) ৩. পল্লীসঙ্গীতে পালাগান (১৯৩৬) ৪. এদেশের ভিখারী সম্প্রদায় (১৯৩৬) ৫. শেওলার পালা (১৯৩৬) ৬. আম্রতত্ত্ব (১৯৩৭) ৭. অপ্রকাশিত পুতুল বিয়ের ছড়া (১৯৩৮) ৮. অপ্রকাশিত বাউল সঙ্গীত (১৯৩৮) ৯. জলসওয়ার গীত (১৯৩৮) ১০. নাইওরের গান (১৯৩৮) ১১. মাঘমঙ্গল (১৯৩৮) ১২. বরজের গান (১৯৩৮) ১৩. পরিহাস সঙ্গীত (১৯৩৮) ১৪. রোকেয়া জীবনী (১৯৩৮) ১৫. উপাখ্যানমূলক সঙ্গীত (১৯৩৮) ১৬. পাখির গান (১৯৩৮) ১৭. ভাই ফোঁটার গান (১৯৩৮) ১৮. বর্ষার কাব্য (১৯৩৯) ১৯. অপ্রকাশিত পল্লীগীতি (১৯৪৪) ২০. সাগরতীর্থে (১৯৪৬) ২১. নাটকীয় কাহিনী (১৯৪৮) ২২. টি.এস.এলিয়ট (১৯৪৮) ২৩. ছোটদের ছবি আঁকা (১৯৪৮) ২৪. প্রাচীন চীনা চিত্রকলার রূপ ও রীতি (১৯৪৯)। লোকসঙ্গীত, ছড়া তথা

লোকসাহিত্য অনুসন্ধানে অন্তর্নিহিত রয়েছে অদ্বৈত মল্লবর্মণের এক গূঢ় অভিপ্রায়, তাঁর এ প্রচেষ্টা প্রধানত সমৃদ্ধ হয়েছে জীবনের যোগে, প্রাণের যোগে। তাঁর প্রাণের যোগ গ্রামে গাঁথা দেশের গ্রামীণকে নিয়ে, সে গ্রামীণ-রূপ চিরকালের। এরা গ্রামবাংলার নিভৃত জগতের সংবাদ বহন করে আনে। তাঁর কাছে এর মূল্য কেবল সাহিত্যরসিক হিসেবে নয়, ঐতিহ্য ও দেশ-সন্ধানী রূপেও। এই অন্বেষণ রবীন্দ্রনাথেও পাই, *লোকসাহিত্য* গ্রন্থের তিনটি প্রবন্ধই বিষয়গত ও ভাবগত দিক থেকে তাঁর রচনাসমূহ থেকে আলাদা। এ পর্যায়ে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রেনেসাঁসের পর থেকে দু'তিনশ বছর 'এনলাইটেন্‌মেন্ট' বা জ্ঞানদীপ্তির যুগে ক্লাসিকপন্থী জীবনদর্শনের প্রাধান্যের কালে যে-যে প্রত্যয় মানুষের কাছে বিশ্বস্ত হয়ে উঠেছিল; যেমন — বুদ্ধির সার্বভৌমত্ব, কিংবা মানুষের জাতিধর্মগত দেশকালগত ভেদে অনাস্থা — মৌলিক অভেদে অর্থাৎ সর্বমানবিক ঐক্যে আস্থা অথবা শিক্ষার মূল্য বা সভ্যতার অগ্রগতি ইত্যাদি — উনিশ শতকে এসে অনেকেই বিশেষ করে রোমান্টিক কবি-শিল্পীরা এই সব প্রত্যয়ের অধিকাংশ সম্পর্কেই বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলেন। রোমান্টিকদের আস্থা ছিল এর বিপরীত প্রত্যয়ে অর্থাৎ সর্বমানবিক ঐক্যের বদলে বিভিন্ন দেশের বিশিষ্টতার উপরে, বিভিন্ন জাতীয়-মানসের চূড়ান্ত স্বাতন্ত্র্যে; শিক্ষা ও সভ্যতার জটিলতা-কৃত্রিমতার বদলে আদিমতা ও শৈশব-সারল্যে, উন্নতি ও অগ্রগতির বদলে অতীতের সত্যযুগে বা স্বভাবে ফিরে যাওয়ায়, প্রকৃতি-নিসর্গ-অরণ্য কিংবা গ্রামীণতায় ফিরে যাওয়ায়। ক্রমবর্ধমান শিল্প-সমস্যা, সাধারণ মানুষের সমস্যাসংকুল জীবনযাত্রা, পুঁজি-বাণিজ্য প্রসারের অংশ হিসেবে জীবনব্যবস্থার নগরায়ণ, বোধ-বুদ্ধি-দর্শনের একমুখিতা প্রভৃতি প্রতিবন্ধকতা; সর্বোপরি শিল্প-সভ্যতার ক্রমবর্ধমান স্ফীত রূপ আত্তীকরণ করতে না পারায় রোমান্টিক শিল্পী-সাহিত্যিকেরা মুক্তিকামী হয়েছেন। এই মুক্তি অন্বেষা কখনও কখনও ছিল নগরজীবনের পরিবর্তে লোকজীবনে, নগরসংস্কৃতির বদলে লোকসংস্কৃতিতে, শহরের উচ্চসম্প্রদায়ের পরিবর্তে গ্রামের লোকসাহিত্যে। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে পরিবর্তিত অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক এমনকি সাংস্কৃতিক কাঠামোয় স্বদেশিয়ানার চর্চা, অর্জিত শিক্ষা-সংস্কৃতি, লৌকিক-পৌরাণিক মূল্যচেতনা-বিশ্বাস এককথায় জাতির অতীত ঐতিহ্যের সাথে নিজেদের যুক্ত করেই শুরু হল। সাম্রাজ্যবাদ প্রতিরোধের চেতনা কিংবা দেশ ও জাতির স্বাতন্ত্র্য এবং আত্মসম্মানের পথ গড়ে উঠেছিল ধীরে ধীরে। জাতি হিসেবে আত্মরক্ষণ, আত্মানুসন্ধানের সাফল্য ঘটেছিল অভিজাত সংস্কৃতিবানদের নেতৃত্বে। তবে তা কেবল বুদ্ধিজীবীদের বিদ্যাচর্চার বিষয়মাত্র হয়ে ওঠে নি; ঐতিহ্যের নৈকট্য, অবিরাম সংযোগ, দেশ-চেতনার অকৃত্রিম ভাবাবেগ ভারতবর্ষের বৃহত্তর জনজীবনের সংস্কৃতির অন্তরঙ্গ-চর্চার স্মারকচিহ্ন হয়েছে।

'লোকসাহিত্যের বা গ্রামীণ সাহিত্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ সাহিত্যরসিক হিসেবে, দেশসন্ধানী হিসেবে, রোমান্টিক হিসেবে নয়' — (সত্যেন্দ্রনাথ, ২০০৩ : ১৯৫) সমালোচকের এ বক্তব্য সমর্থন করা যায়। একই কথা অদ্বৈত মল্লবর্মণের লোকসাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রেও সত্য। তবে লোকসাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি পাশ্চাত্য রোমান্টিকদের বিরাট আগ্রহের মূলে তাঁদের নিজেদের জীবনগত উদ্বেগ, পরিবর্তিত জীবন-পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াতে না পারার উৎকণ্ঠা কাজ করেছে। উনিশ-বিশ শতকের বাঙালি

সাহিত্যিকদের মাঝেও সমকালীন অব্যবহিত বাস্তবতার প্রতি কিছুটা অস্থিরতা ছিল। কিন্তু এর ফলে কোনো বিক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া, শিক্ষা-সভ্যতা অগ্রগতিবিরোধী কোনো অভিমান থেকে তাঁরা লোকসংস্কৃতির অভিমুখী হয়েছেন — তা নয়। আর লোকসংস্কৃতিপ্রীতি নিয়ে তাদের কোনোরকম স্বেচ্ছাসম্মোহনের দৃষ্টিও প্রধান হয়ে ওঠেনি। জাতির প্রাণশক্তির উৎস যে লোকজীবনে এবং সংস্কৃতির প্রথম ও পূর্ণ বিকাশ যে লোকসংস্কৃতিতে — এই বোধ তাঁদের ছিল। লোকসাহিত্য বিষয়ে অদ্বৈত মল্লবর্মণ রচিত প্রবন্ধগুলো পড়লে বোঝা যায়, এখানে তাঁর মনোভাব বিশুদ্ধ সাহিত্যপ্রেমিকের, লোকজীবনের সাথে নিজের একান্ত নিবিড়তর পরিচয়ের সহজতা তো ছিলই। রয়েছে ঐতিহাসিকের, সমাজতাত্ত্বিকের দৃষ্টিও। আর সবচেয়ে যেটি বড় ব্যাপার তা হল — লোকসাহিত্যের উপকরণ নির্বাচন ও বিশ্লেষণে রক্ষণশীলতা নেই তাঁর রচনায়।

লোকসাহিত্য যে একান্তই প্রাণের বস্তু; পল্লির সাধারণ মানুষের নির্ভেজাল মন থেকে উৎসারিত– অধিকাংশ প্রবন্ধে এ প্রসঙ্গটি বারবার উপস্থাপন করেছেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ। তিনি লিখেছেন :

> ... এগুলি মনন, চিন্তা বা কল্পনা দিয়া গড়া নয়... এগুলিতে পাওয়া যায় খাঁটী প্রাণের স্পর্শ ['অপ্রকাশিত পল্লী গীতি'; অদ্বৈত, ২০০০ : ৬৪]
>
> তাঁহারা গান গায় কাজ করিতে করিতে। গানে যশ লাভের স্বপ্ন তাহাদের মধ্যে খুবই কম। প্রাণের সহজ স্ফূর্তিতে তাহারা আবেগভরে গানগুলি গাহিয়া যায়। ['দুইটি বারমাসী গান'; অদ্বৈত, ২০০০ : ৭০]

বারমাসী সঙ্গীত প্রসঙ্গে আলোচনার এক জায়গায় লিখেছেন :

> ত্রিপুরার পল্লীগ্রামগুলিতে প্রধানত লীলার বারমাসী, ফুল্লরার বারমাসী, সীতার বারমাসী, মা-বাপের বারমাসী, রাধার বারমাসী এবং শান্তিকন্যার বারমাসী গীতগুলি গীত হইতে দেখা যায়। কি কবিত্ব হিসাবে, কি ভাবে, কি ভাষায়, কি শব্দমাধুর্যে সবগুলি বারমাসীই খুব সুন্দর। পল্লীর প্রাণের যথার্থ আবেগ ও বেদনা যেন গানগুলিতে মূর্ত হইয়া ফুটিয়া রহিয়াছে। পল্লীকে বুঝিতে হইলে, পল্লীর ব্যথা বেদনা ও সাধ আকাঙ্ক্ষাগুলিকে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে পল্লীর নিজস্ব সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচিত হওয়া আবশ্যক বলিয়া মনে করি। কারণ, ইহার মধ্যে পল্লীর নিজস্ব ভাবধারাটি ওতঃপ্রোতভাবে বিজড়িত রহিয়াছে। ['ত্রিপুরার একটি বারমাসী গান'; অদ্বৈত, ২০০০ : ৬৬]

লোকসাহিত্য সংগ্রহ বা সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা কিংবা তার রস আস্বাদনের উপায় সম্পর্কে লিখেছেন অদ্বৈত। দীনেশচন্দ্র সেনের সংগৃহীত পূর্ববঙ্গের যেসব লোকসাহিত্য রয়েছে সেগুলোর প্রত্যেকটিকেই 'উজ্জ্বল রত্ন বিশেষ' আখ্যা দিয়ে অদ্বৈত বলেন, "আমাদের খাঁটি জাতীয় জীবনের হাসি কান্নায় ইহাদের এক একটি সমুজ্জ্বল। ... আমাদের সাধ্য কি যে আমাদের জাতীয় জীবন হইতে ইহাদের হাসি অশ্রুকে মুছিয়া ফেলিতে পারি!" (অদ্বৈত, ২০০০ : ৭৭)। এছাড়া লোকসাহিত্যের উপাদান সংগ্রহে সততা ও আন্তরিকতাকে তিনি উচ্চমূল্য দিয়েছেন। পাশাপাশি একে আস্বাদ্য করার প্রয়োজনে পাঠকের অনুভূতিকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টাও করেছেন তিনি। এ প্রসঙ্গে লিখেছেন :

> পল্লীর লুপ্ত সম্পদ যিনি যাহা সংগ্রহ করিবেন তাহাই অক্ষতভাবে রাখিয়া প্রকাশ করিবেন এবং উহা হইতে পল্লীর পারিবারিক জীবনকে study করিবার চেষ্টা করিবেন, তাহা হইলেই তিনি ধন্যবাদের পাত্র হইবেন। আরও দেখিতে পাই, অনেকেই শ্রদ্ধেয় দীনেশবাবুর সংগ্রহগুলি চর্বিত-চর্বণ করিয়া প্রবন্ধাদি লিখিয়া থাকেন। এইরূপ না করিয়া পল্লী হইতে নূতন নূতন রত্ন আবিষ্কারের চেষ্টা করিলে আমার বিশ্বাস অনেকেই সফলকাম হইবেন। (অদ্বৈত, ২০০০ : ৭৭)

তিনি এও জানেন, শুধু সংগ্রহ করলে হবে না, সেইসব মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যে ডুবে যেতে হবে; তাদের কথা ও সুরের প্রতিটি স্পন্দে পল্লিবাসীর যতটুকু দরদ-সাধ-আহ্লাদ-অশ্রু জমে আছে, তা অনুভব করতে হবে মনে-প্রাণে, হয়ে উঠতে হবে তাদেরই একজন। সমালোচনা করতে গিয়ে অদ্বৈত নিজে তা-ই করেছেন।

লোকসাহিত্যের এসব বিরাট উৎস তিনি গভীরভাবে আস্বাদন করেছেন, বিষয়বস্তু বা কাহিনির ব্যাখ্যা যখন দিয়েছেন, তখন প্রায়ই তা নতুন সৃষ্টির মতো হয়ে উঠেছে। লোকপ্রাণের গান-সুর-চেতনা, বয়ে-চলা জীবন সবকিছু তিনি যুক্তিনিষ্ঠভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, সৃজনশীল বিম্বধর্মী গদ্যে। তাঁর নিজের কবিস্বভাব গদ্যভঙ্গিমাকে আরো বেশি সমৃদ্ধ করেছে। অনেক লোকগানে কিংবা ছড়ায় বাঙালির সমাজজীবনের, পারিবারিক জীবনের ছায়াপাত সুস্পষ্ট। শিশু বা বালিকা কন্যার বিয়ে, কিশোর-কিশোরীর প্রেম, অপ্রাপ্তবয়স্ক অনভিজ্ঞা কন্যার শ্বশুরবাড়ি যাত্রা, শ্বশুরবাড়ির অত্যাচার, হিন্দু সমাজের অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদপ্রথা, পার্বণ-উৎসব-গ্রাম্যপ্রকৃতি — অসংখ্য টুকরো ছবির মধ্য দিয়ে চিরকালের গ্রামবাংলার দৈনন্দিন জীবনযাপনের চলতি রূপ ফুটে উঠেছে। অদ্বৈতের প্রবন্ধে গ্রাম-বাংলার সেই সহজ স্বাভাবিক চিত্রই উঠে এসেছে। রয়েছে নদীনির্ভর মালো-মনের 'ডায়ালেকটিক'।

কথাসহিত্যে পল্লিজীবনকে প্রধান বিষয় করেছেন অনেক লেখক। এতে তার নিজস্ব বিশেষ প্রবণতা, মানসভঙ্গি অগ্রাধিকার পেয়েছে আবার ভিন্ন বাস্তবতাও কাজ করেছে। যেমন নগরকেন্দ্রিক জীবন ব্যবস্থার বিরূপ প্রতিক্রিয়া, সভ্যতার শহুরে প্রতিবিম্ব ধীরে ধীরে শহরতলি ছাপিয়ে গ্রাম-গ্রামান্তরে বিস্তৃত হওয়া ইত্যাদি। "শহর জীবন থেকে সরে স্বাদ বদলাতে, নতুন মানুষ ও জীবনপদ্ধতি, সামাজিক অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থা জানার জন্য কথাসাহিত্যিকেরা লিখেছেন ইতিহাস নিয়ে উপন্যাস — সেখানে আছে রোমান্সের ঘন বাতাবরণে গ্রামজীবন, লিখেছেন গ্রামেরই বিশেষ অঞ্চলকে নিয়ে কথাসাহিত্য — তাতে আছে গ্রামেরই বিশাল কোনো এক প্রত্যন্ত অঞ্চলের লোকজীবন-কথা, ইতিহাস, জনজীবনের গা-ঘেঁষা মাটির গন্ধের পরিবেশ তাদের মানুষগুলির কথায়, কাজে চলাফেরার সূত্রে। (বীরেন্দ্র, ১৯৯৮ : ১৪২)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা-উত্তরপর্বে লেখা উপন্যাসের বিষয়-বৈচিত্র্য এবং লেখক-প্রতিপাদ্য লক্ষ করলে বোঝা যায়, পল্লিজীবনকেন্দ্রিক কথাসাহিত্য রচনায় রচয়িতার বিশিষ্ট মানসক্রিয়াই এই বৈচিত্র্যের মূলে সক্রিয়। যুগ ও সময়ের প্রতিক্রিয়া এবং গভীর পরিবর্তনের চরিত্র দেখানোর উদ্দেশ্যের পাশাপাশি ভারতবর্ষের ভৌগোলিক বাতাবরণে লালিত বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর যাপিত জীবনের সহজতার প্রতি লেখকের জন্মসূত্রে পাওয়া আকর্ষণ; স্বক্ষেত্রের স্বপ্ন ও স্মৃতির অভিজ্ঞতার সযত্ন প্রতিপালন ও অন্বেষণ কাজ করেছে। বাংলা কথাসাহিত্যে পল্লিজীবনকে গ্রহণ করতে

গিয়ে অভিজ্ঞতার সীমারেখা অতিক্রম করতে চান নি কিংবা স্বতঃস্ফূর্ত ও সচেতনভাবে একে বিষয়বস্তু করেছেন এরকম কয়েকজন কথাসাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক হলেন — বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৬), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬), সুবোধ ঘোষ (১৯০৯-১৯৮০), নরেন্দ্রনাথ মিত্র (১৯১৬-১৯৭৫), অদ্বৈত মল্লবর্মণ প্রমুখ। এঁদের মধ্যে কেউ বিশেষ মানস প্রবণতার সূত্রে, কেউ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে আর্থ-সামাজিক উৎপাদন কাঠামো, শ্রেণিচরিত্র বিচারে গ্রামকে কথাসাহিত্যে স্থান দিয়েছেন। অনেকে আবার একই সঙ্গে গ্রাম ও শহর দুই জীবনের চিত্র এঁকে তাঁদের শিল্পীমনের বিষয়-অন্বেষণ বৈচিত্র্য প্রমাণ করেছেন।

একটি বিশেষ ভৌগোলিক সীমা-পরিসর অন্তর্গত মানবসম্প্রদায়ের আচরণ-উচ্চারণ, আর্থ-সামাজিক উৎপাদন কাঠামো, শিষ্টাচার-লোকাচার, বিশ্বাস-সংস্কার, ইতিহাস-ঐতিহ্যের যথাযথ রূপায়ণ ঘটে যে উপন্যাসে তাকে আঞ্চলিক উপন্যাস বলা যায়। অদ্বৈত মল্লবর্মণের *তিতাস একটি নদীর নাম* উপন্যাসটিকে এই বিশেষ অর্থে আঞ্চলিক বলা যায়। অবশ্য সাহিত্যক্ষেত্রে আঞ্চলিকতা-বিষয়ক ধারণা ভৌগোলিক মাত্র, সাহিত্যিক ধারণা নয় এ সমালোচনাও আছে।[২] তবে সাহিত্য বা উপন্যাস পরিবেশবিচ্ছিন্ন কোনো শিল্পপ্রয়াস নয় এবং কোনো জনগোষ্ঠীর বহমান জীবনধারা নিয়ে রচিত উপন্যাস বয়নবিন্যাসে শিল্পসম্মত রূপ পেলে সর্বজনীন তথা সর্বকালীন মানুষের হার্দ্য সম্পদ, ঐতিহ্যিক উত্তরাধিকার হয়ে ওঠে। '*তিতাস একটি নদীর নাম* উপন্যাসে তিতাস এবং তিতাস-তীরবর্তী অঞ্চলের local color and habitations পরমসূক্ষ্ম পরিচর্যায় উপস্থাপিত হয়েছে।' (গিয়াস, ২০০২ : ১১)। বেশ কিছু কারণে উপন্যাসটি প্রাকৃত জীবনকে ধারণ করেও লোকজীবনের বৃহৎ দিগন্ত উন্মোচনকারী এবং সর্বজনীন শিল্প হয়ে উঠেছে। প্রথমত সেই জনগোষ্ঠীর সাথে অদ্বৈতের পরিচয়ের প্রত্যক্ষতা; নৃ-তাত্ত্বিক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে উচ্চমূল্যে প্রকাশ করার অন্তরঙ্গ গভীর দৃষ্টি; সংস্কৃতি-চেতনা, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোর সূক্ষ্ম বাস্তবতাকে ব্যাখ্যা করা; ঔপনিবেশিক শোষণের সামূহিক চাপ; সমাজবিকাশে সৃষ্ট শ্রেণিচরিত্র জটিলতার সমাজতাত্ত্বিক বিবরণ; সর্বোপরি প্রকৃতিজ ও প্রকৃতি-নির্ভর প্রাকৃত জীবনের শেকড়কে ঐতিহাসিকতা, ঐতিহ্যের পূর্বাপরতা ও জীবনসংলগ্নতার আরো গভীরে ছড়িয়ে দেয়ার সার্থকতা; সর্বোপরি উপন্যাসটির সংগঠন পরিকল্পনায় একান্ত দেশজ আবহ বা 'ফর্মের' সৃষ্টি উপন্যাসটিকে অনন্য ও বহুভঙ্গিম বৈচিত্র্যের মহিমায় অধিষ্ঠিত করেছে। একজন সমালোচক লিখেছেন :

> মালোপাড়ায় ঘুরে ঘুরে অদ্বৈত ব্যক্তিসত্তা নয় বরং তুলে এনেছেন পুরো গোষ্ঠীর ব্যবহারিক সত্তা, অর্থাৎ একটা ঐতিহ্য, একটা বর্গ চিহ্ন রেখে গেছে তাদের হারিয়ে যাওয়া মার্গের, আর চিন্তকের ভিশন দিয়ে অদ্বৈত যেন এই আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটকেও ধরতে চেয়েছেন চরিত্রের ভেতর অনুপ্রবেশ করে, কথোপকথনের আত্যন্তিক আন্তরিকতা খনন করে। (রমিত, ১৪২১ : ১৪০)

আসলে লোকসংস্কৃতির বিরাট আকরে অদ্বৈত রেখে গেছেন একটি ক্ষয়ে যাওয়া সমাজের পটভূমি, কৌম মনোবিশ্লেষণ, এক অটুট লোকসত্তার নির্লিপ্ত, নির্জন প্রতিবাদ, সেখানে রয়েছে স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য, সাম্য-আসাম্যের দ্বান্দ্বিকতা; রয়েছে উচ্চবর্গের প্রভুত্বে দমে থাকা

প্রান্তিক মেকানিজমের কালাতিক্রমী বিবরণ। বহিরাগত সংস্কৃতির অনিরুদ্ধ প্রবল অভিঘাতে লোকসত্তার মূল সুর বিনষ্টির যে চিত্র এঁকেছেন তিনি, তা গোটা জাতির সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ব পচনের বার্তায় পরিণত হয়। এছাড়া একটি মৃতপ্রায় জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিকে পুনর্বাসন করে তিনি কেবল মালো সমাজের নন, হয়ে উঠেছেন ভারতবর্ষের প্রতিনিধি। আর সবচেয়ে যেটি বড় কারণ, তা হল কল্পকথক হয়ে নয়, অন্ত্যজ শ্রেণির একজন হয়ে সেই জীবনের ভাঙাগড়ার নিঃশব্দ নিয়তি এঁকে অদ্বৈত আমাদেরকেও সংঘাতের পরম এক প্রস্তুতির সামনে দাঁড় করিয়ে দেন। এই সংঘাত তথা অলঙ্ঘ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা জীবনের সাথে জীবনের, জীবনের সাথে রাষ্ট্রের, মানুষের সাথে প্রাচীন ও নব্য ঔপনিবেশিকতার।

অদ্বৈত মল্লবর্মণের *শাদা হাওয়া* দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে (১৯৩৯-১৯৪৫) রচিত। ঔপন্যাসিক এ সময়ে কলকাতায় মাসিক 'মোহাম্মদী' এবং দৈনিক 'আজাদ' পত্রিকায় কর্মরত ছিলেন। সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও তার বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকামী রাজনৈতিক শক্তির সফলতা-ব্যর্থতা; ইংরেজদের ক্ষমতা দখলে ও প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ও ইংরেজ শাসনের দেশীয় প্রতিনিধির ভূমিকা; তাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষের পরিণতি ইত্যাদি প্রাথমিকভাবে *শাদা হাওয়া* উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বলে মনে হয়। কিন্তু "*শাদা হাওয়া* আসলে সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী পরিস্থিতি (post colonial situation)-কেই ব্যাখ্যা করতে চেয়েছে। বাংলা সাহিত্যে এরকম যুগাতিশায়ী লেখা খুব বেশি নেই।" (অচিন্ত্য, ২০০০ : ০৮) ঔপনিবেশিক শক্তি ভারতের শাসন ব্যবস্থা-সমাজ-সংস্কৃতি সব গ্রাস করেছিল। তাই স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে যাত্রা শুরু হলেও বিশ্বায়ন ও বণিকায়নের বিপুল প্রভাবে নব্য উপনিবেশ-সৃষ্ট অভিঘাত আরম্ভ হয় খুব তাড়াতাড়ি। গোটা ভাতরবর্ষের জনগোষ্ঠীর এই মনোজাগতিক উপনিবেশের ভয়াবহতা ও তার ভবিষ্যৎ অনুধাবন করেছিলেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ। উপন্যাসে ইংরেজ সৈনিক টম চরিত্রকে সেই সত্যটা ভেবে তীব্র আনন্দিত হতে দেখা যায়। টমের মধ্য দিয়ে এর একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন অদ্বৈত : টম জানে, এটা কূটনৈতিক চাল, তাই সূক্ষ্ম এই পথ ধরেই এগুতে হবে। সে পথ উপনিবেশায়িত জনগোষ্ঠীর মানসিক আনুগত্যকে ব্যবহার করার পথ। টম এও জানে :

> সাম্প্রতিক রাজনৈতিক হাওয়া থেমে গেলে, তাদের মনের বিপ্লবও শান্ত হয়ে যাবে — কিন্তু যে শ্রদ্ধা তাদের মনে স্বর্ণরেখায় বসে আছে, তার ধ্বংস নেই। আনুগত্যের কণ্ঠ তারা; মানে এই সমস্ত বিদ্রোহী, যারা আজ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের safren gown পরতে সঙ্কোচ বোধ করছে, এগিয়ে দেবেই। আমাদের খালি শক্ত হতে হবে। ভাবধারায় প্লাবনের শক্তি আছে জানি, কিন্তু এ প্লাবন শুধু বিশেষ কোনো দেশের নয় — আমাদের ভাবধারা প্লাবিয়ে দিয়েছি আমরা, তার স্রোতের আর বিরাম হবে না কোনো কালে। ব্রাভো! (অদ্বৈত, ২০০০ : ৬৮৪)

টমের অনুভূত সত্য যৌক্তিক; কারণ উপনিবেশগুলো স্বাধীন হওয়ার পরও তার সমাজ ও সংস্কৃতিতে উপনিবেশী প্রভাব পুরো জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস, চর্চায়, কর্মে ছড়িয়ে রয়েছে। এই উপনিবেশী বিন্যাসগুলোর মোকাবিলার জন্যে অর্থাৎ উপনিবেশের সাংস্কৃতিক প্রভাব প্রতিরোধের জন্য আধিপত্যমুক্ত জ্ঞানচর্চা কিংবা প্রতিরোধী জ্ঞানভাষ্য (counter-discourse) প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা পরবর্তীকালে প্রবলভাবে অনুভূত হয়েছে। গড়ে

উঠেছে উত্তর-উপনিবেশবাদী তত্ত্ব। ভারতবর্ষের মানুষের অন্তরে ও বাইরে উপনিবেশের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ও ধরনকে অদ্বৈত তাঁর *শাদা হাওয়া* উপন্যাসে স্পষ্ট করেছেন। এদেশের ঐতিহ্য-অভিজ্ঞতা, সমাজ, সংস্কৃতি সর্বোপরি ভাবনার জগতে ও চর্চার ক্ষেত্রে সক্রিয় উপনিবেশী প্রভাব চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন তিনি। বিশেষত উপনিবেশায়িত ভারতের ঐতিহ্য, স্বদেশিয়ানা, সাংস্কৃতিক-সামাজিক-নৈতিক-রাজনৈতিক এমনকি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, বিশ্বাস কিংবা চেতনার প্রতি সৃষ্ট অভিঘাতসমূহের দীর্ঘমেয়াদী প্রতিক্রিয়ার আভাস দিয়েছেন। এই আক্ষেপের সাথে রয়েছে নিজস্ব সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের উৎস অনুসন্ধানী অধ্যয়ন। উপন্যাসে মার্কিন সৈন্য জীল মৌখিকভাবে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার সমর্থক। যদিও সাম্রাজ্যবাদকে পরোক্ষে প্রয়োগের পক্ষপাতী তারা, তবু টমের সাথে সভ্যতা-অসভ্যতা বিষয়ক দ্বান্দ্বিক তর্কালাপে ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকামী মানুষের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতাকে জীল ব্যাখ্যা করে :

> এদেশে আলাদা দুটো জগৎ, একটাকে দিয়ে তোমরা কাজ চালাচ্ছ আর একটা তোমাদের বিরোধিতা করছে। যারা তোমাদের প্রসাদ পাচ্ছে, তারা ভাবছে, বিরোধীরা এই প্রসাদ না পেয়ে তোমাদের বিরোধিতা করছে। ... আর তোমরা এটা বুঝছো না যে বিরাট অংশ তোমাদের বিরোধিতা করছে, আসল ইন্ডিয়াকে আমরা খুঁজে পেয়েছি সেইখানেই। সেখানে মনুষ্যত্ব আছে, ব্যক্তিত্ববোধ আছে, আত্মাদর আছে, প্রতিভা আছে, আর আছে সাহস। এটাকে তোমরা নিজেরা গড়েছ, আর ওটা গড়ে উঠেছে আপনি, দেশের আসল প্রাণধারা থেকে প্রেরণা পেয়ে। (অদ্বৈত, ২০০০ : ৬৫১)

আর স্বাধীনতা স্বদেশিয়ানা-স্বাজাত্যবোধ পাশ্চাত্য থেকে ধার করা নয়, অদ্বৈত ঘোষণা দেন ওগুলো মানুষের জন্মগত অধিকার। "দেশের প্রাণ কেন্দ্র থেকে শক্তি (যে শক্তি দেশের আত্মার অনু পরমাণু থেকে রস সঞ্চার করে পরিব্যাপ্ত হয়েছে) উৎসারিত হয়ে দাবি জানিয়েছে স্বাধীন হওয়া আমার জন্মগত অধিকার। মানুষের অধিকার হরণের দায়ে সে শক্তি অভিযুক্ত নয়, মানুষের মনুষ্যত্ব অস্বীকারে সে শক্তি কলঙ্কিত নয়।" (অদ্বৈত, ২০০০ : ৬৭৪)। সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতিবিদও সংস্কৃতির ঐতিহ্যিক উত্তরাধিকারের শক্তি সম্পর্কে অবগত। যদিও তারা বিশ্বাস করে পৃথিবীর যে কোনো জাতিসত্তা বা সংস্কৃতি থেকে তাদের চেয়ে সভ্য বা উন্নত নয় এবং "দুঃখের বিষয় তারা বিশ্ব বলতে ইউরোপ আর আমেরিকাকেই বোঝে। আর সমস্যা বলতে ঐ দুই মহাদেশের সমস্যাকেই সমাধানযোগ্য বলে মনে করে। ... কাজেই প্রাচ্যের সমস্যা যে আলাদা কিছু, তাদেরও যে পৃথক একটা সত্তা থাকতে পারে তা তারা কার্যত স্বীকার করতে চান না।" (অদ্বৈত, ২০০০ : ৫৭৬)। সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক দায়কে যাথার্থ্য দিতে তাদের প্রচারিত বয়ানে প্রতিষ্ঠার ঐকান্তিক চেষ্টাও করেছে তারা। *শাদা হাওয়ার* টমের বক্তব্যে এসব প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু টম একথা ভেবে আক্ষেপ করে যে "আমরাই ওদের আলো জ্বালাই। আর সে আলোকিত হয়ে ওরা আমাদেরই শিকার করতে আসে।" (অদ্বৈত, ২০০০ : ৬৫৮)। উপনিবেশায়িতের নিজ ঐতিহ্য-সংস্কৃতি বা জ্ঞানরাজ্যের ক্রমজায়মান বিকাশ এবং সাম্রাজ্যবাদী জবরদস্তি সত্ত্বেও অব্যাহত অপরিবর্তনের সূত্রটি টমের বক্তব্যে ব্যাখ্যাত হয়েছে। *ভারতের চিঠি পার্ল — বাক* কে নামক রচনায় অদ্বৈত একথাটি আরো স্পষ্ট করে বলেছেন। বিশ্বসভ্যতায় ভারত, চীন

কিংবা মিসরের অবদানের কথা গুরুত্বের সঙ্গে মনে করিয়ে দিয়ে তিনি পার্ল বাককে উদ্দেশ করে লেখেন :

> আত্মাভিমানী প্রতীচ্য এসব দানকে অস্বীকার করতে পারে। কিন্তু যে সকল বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে চীন ও ভারত আজও টিকে আছে তাতে করে মেনে নেওয়া যায়, সকল বাধা বিপত্তিতে সোজা হয়ে থাকার মেরুদণ্ড সে তার প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি থেকে পেয়েছে। যে জিনিসের তারা উত্তরাধিকারী, বর্তমান জগৎ সে-সব জিনিসকে গ্রহণ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। [*ভারতের চিঠি — পার্ল বাক কে*; অদ্বৈত, ২০০০ : ৫৭৩]

কোনো দেশের অপরাজিত ও জীবিত আত্মসত্তাই সে দেশে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জোরালো প্রতিবাদী চেতনার জন্ম দেয় — একথা সগৌরবে ঘোষণা দেন অদ্বৈত। তিনি এও জানেন, 'নিজস্ব ভাবধারার ও স্বার্থের অনুকূলে ভিন্ন ভিন্ন দেশের বিভিন্ন মনীষারা বিশ্ববিধান রচনার আয়োজনে ব্যস্ত।' (অদ্বৈত, ২০০০ : ৫৭৪)। এই বিশ্ববিধান অর্থাৎ "রাজ বা সাম্রাজ্য-তন্ত্রটা এমন জিনিস, যাকে টিকে থাকবার জন্যে আগে রাখতে হয় মর্যাদা রক্ষার ও পর্যাপ্ত ভয় দেখাবার ক্ষমতা। তারপর তার রক্তপিপাসু হয়ে ওঠার মতো নৃশংসতা — এ না হলে তার কণ্ঠ অনেক আগেই জনতার চাপে নিষ্পেষিত হয়ে যেত।" (অদ্বৈত, ২০০০ : ৫৬৭)। তাছাড়া 'এক রাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদ আরেক রাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদকে পুষ্ট রাখার জন্য' চেষ্টা করছে। সাম্রাজ্যবাদ মূলত 'একটা বিরাট ব্যবসায়'; আর এ পুঁজিতন্ত্র, বেনিয়া বৃত্তি তথা 'vested interest' চালু রাখার জন্য তারা জনশোষণসহ যে কোনো অন্যায় করতে পারে, এমনকি যুদ্ধও। অদ্বৈত জানেন, এই যুদ্ধও আসলে 'আন্তর্জাতিক লুঠতরাজ' এবং বিশ্বের কতগুলো দেশ আসলে 'আন্তর্জাতিক লুঠের মাল।'(অদ্বৈত, ২০০০ : ৫৭৬)

ভাব ও ঐতিহ্য নিয়ন্ত্রণের প্রধান কয়েকটি শক্তি যথা জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্যশিল্পকর্ম সর্বোপরি চিন্তারাজ্যের জড়তা, সীমাবদ্ধতা, দেশীয় অপসংস্কারের একদেশদর্শিতা ইত্যাদি উপনিবেশিত জনগোষ্ঠীর স্বতন্ত্র আত্মতা প্রতিষ্ঠার প্রধান প্রতিবন্ধকতা বলে মত দিয়েছেন লেখক। রাজনৈতিক-প্রশাসনিক স্বাধীনতার পরেও উত্তর-উপনিবেশিক পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রয়োজন আত্ম-উদ্বোধন, সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ-সংগ্রাম। ভাবাধিপত্য থেকে প্রয়োজনীয় মুক্তি আসতে পারে বৃহত্তর জনগণের সাংস্কৃতিক ক্রিয়াশীলতায়, বোধে ও ভাবের সংগ্রামে। ভারতবর্ষের বাঙালি জাতির সাংস্কৃতিক রূপ-রূপান্তর, কাঠামোর অন্ত ও বহির্চাপ না বোঝার মতন আচ্ছন্নতা বা ভাবাবেগ ছিল না অদ্বৈত মল্লবর্মণের। সাম্রাজ্যবাদের বহির্বাস্তবতার ফলাফলও তিনি জানতেন, গোকর্ণঘাটের 'জাউলার পোলা'কে[৩] জীবিকার প্রয়োজনে ও জীবনপট পরিবর্তনের ফলে নগরজীবন বেছে নিতে হয়েছিল। আজন্ম যেখানে লালিত হয়েছেন সেই পরিবেশ তাঁকে সবসময় টেনেছে। *ভারতের চিঠি — পার্ল বাক কে* নামক গ্রন্থটি ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্তের ভাতুষ্পুত্র রঞ্জিৎ দত্তকে উৎসর্গ করেছেন অদ্বৈত, উৎসর্গ-পত্রে লিখেছেন —

> ছায়াঘেরা পল্লীর সজলতা মাড়িয়ে এসে ক্ষমাহীন নাগরিক রুক্ষতার ধূসর রূপের আগুনে জ্বলেই যেতুম — যদি আপনার প্রীতি-আর্ত প্রাণ পাখা মেলে না ধরতো।

নগর ও গ্রামীণ জীবনব্যবস্থার বৈপরীত্য কিংবা গ্রামীণ জীবনপটকেই সমৃদ্ধ ও একমাত্র প্রমাণ করা অদ্বৈতের উদ্দেশ্য ছিল না। নদীমাতৃক বাংলাদেশের জেলে মালো সম্প্রদায় বা

বর্ণ ও শ্রেণি শোষিত অন্ত্যজ মানুষের জীবন-সংগ্রাম, এদেশের গ্রামীণ অর্থনীতির ইতি-নেতি, সংস্কার-বিশ্বাস সবই অকপটে বলে গেছেন তিনি। সুতরাং লোকসাহিত্যিক লোকসংস্কৃতির রূপকার হিসেবে অদ্বৈতকে একপেশে অভিধা দেয়া অযৌক্তিক। সমকালে জীবনকে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তিনি — যার বেশিরভাগ এদেশের লোকজ ও প্রাকৃত খাঁটি জীবন থেকে উঠে এসেছে ; সমকালীন অন্যান্য সাহিত্যিক-প্রকাশের প্রবণতা থেকে তা প্রায় আলাদা। সংস্কৃতির নির্যাসকে এর উৎস থেকে নিরন্তর অন্বেষণ করেছেন তিনি। আর তাঁর এই অন্বেষণ একজন ভূমিপুত্রের, তাই সব শিল্প-রচনার শুরুতে তিনি বারংবার জারিত হয়েছেন তাঁর স্বরূপের সঙ্গে, "জলের দাগের সঙ্গে যেখানে তুলে এনেছেন জলধারাঙ্কিত ক্ষীণ রেখার মতো জীবনপ্রবাহের ধারাপাতগুলি, সাধনা করে গেছেন জল শব্দের মানে, গোটা একটা মালোসমাজের বেড়ে-ওঠা এবং ক্ষয়ে-ওঠা নিয়ে তিনি ফিরে এসেছেন কেন্দ্রে-শিকড়ে — যেখানে রয়েছে সহজানন্দে বিলীন হওয়ারই এক প্রশিক্ষণ শিবির; বালি থেকে জল-ঘুরে-ফিরে জলের মালিক হয়েছেন অদ্বৈত — প্রাকৃত ও অন্ত্যজ মানুষের মার্গীতাই হয়ে উঠেছে তাঁর আনন্দ, তাঁর প্রতিস্রোত..." (রমিত, ২০১৪ : ১২৭)। এদেশের মৃত্তিকা, মানুষের জীবিকা, জীবন-ইতিহাস-ঐতিহ্য সবকিছুর সাথেই তাঁর গভীর ঘনিষ্ঠতা ও তা থেকে জন্ম নেয়া তাঁর শিল্পীসত্তার ধরন অন্য অনেকেরই মত তথ্য সংগ্রহ করে প্রশিক্ষিত বা আত্মীকৃত হবার মতন নয়, তাই এই শিল্পীর আত্মপ্রকাশ এত আলাদা।

এদেশের মানুষের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক সংগ্রাম তথা বৈরী জীবনকে প্রত্যক্ষ করে এক অপমানিত ক্ষুব্ধ জিজ্ঞাসায় আর্ত ছিল তাঁর চেতনা। "এটা শুধু বস্তুগত উপলব্ধি নয়, এদেশের ঐতিহ্য এবং সাংস্কৃতিক ক্ষয়-ক্ষতি থেকেও তা উপ্ত হয়েছিল।" (শান্তনু, ১৯৮৭ : ৯২-৯৩)। মূলত সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের চেতনাসমৃদ্ধ এবং আন্তর্জাতিক বোধসম্পন্ন একজন ভিন্ন মাত্রার রাজনৈতিক শিল্পী হিসেবেই অদ্বৈত মল্লবর্মণকে একালে পুনরাবিষ্কার করা সম্ভব।

টীকা

১. "কবিতায়ও অদ্বৈত মল্লবর্মণ ছিলেন প্রগাঢ় আন্তরিক এবং অসম্ভব সৎ। অদ্বৈত মল্লবর্মণ ছিলেন মূলত কবি। এবং তিনি কবি প্রতিভা নিয়েই জন্মেছিলেন।" (তিতাশ, ২০০১ : ১৮)

২. কোনো কোনো সাহিত্যসমালোচক মনে করেন, সাহিত্যক্ষেত্রে আঞ্চলিকতা বিষয়ক ধারণা ভৌগোলিক ধারণা মাত্র, সাহিত্যিক ধারণা নয়। তাঁদের মতে, যে কোনো সাহিত্য সৃষ্টিই বিশেষ একটি অঞ্চলভিত্তিক এবং সে অঞ্চল গ্রাম, শহর, বন্দর, শিল্পকেন্দ্র, কৃষিক্ষেত্র, বাজার, মাজার, সাধু-সন্তের আস্তানা অথবা নদী-তীরবর্তী কোনো ক্ষুদ্র লোকালয় হতে পারে। সাহিত্য বা উপন্যাস যেহেতু পরিবেশবিচ্ছিন্ন কোনো শিল্পপ্রয়াস নয়, সেহেতু এ মাধ্যমে রূপায়িত হয় বিশেষ স্থানকাল বা অঞ্চলশাসিত মানুষের জীবনকাহিনি। সুতরাং আঞ্চলিকতা প্রসঙ্গটি সাহিত্য-শিল্পে একটি আরোপিত, অবাঞ্ছিত, সংকীর্ণ প্রসঙ্গ; যা সাহিত্যের সর্বজনীন ধারণাকেই বিনষ্ট করে। এ সম্পর্কে দীপেন্দু চক্রবর্তী লেখেন, "আঞ্চলিকতা বলে যে ধারণাটি গড়ে উঠেছে, তা সাহিত্য-বিচারের মূলে আঘাত দেয়। ... সব সাহিত্যই বিশেষ বিশেষ অঞ্চলকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে। ... যাকে আমরা মহান সাহিত্য বলে মানি, তা সার্বজনীন হয় এই আঞ্চলিক চরিত্রকে আশ্রয় করেই, তাকে অস্বীকার করে নয়। আঞ্চলিক কথাটির মধ্যে একটা ভৌগোলিক সংকীর্ণতার ইঙ্গিত থাকে, যা কখনই সাহিত্যবিচারের মুখ্য বিষয় নয়। (দীপেন্দু, ১৯৭৮ : ০২)

৩. 'পুঁথিঘরে' অদ্বৈত যখন প্রথম 'তিতাসের'র পাণ্ডুলিপি জমা দেন তখন তাঁর সতীর্থ অধ্যাপক সুবোধ চৌধুরী বলেছিলেন, "মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখলেন 'পদ্মানদীর মাঝি' আর কি তোমার বই মানুষ নেবে?" তখন তার উত্তরে অদ্বৈত যা বলেছিলেন তাতে একেবারে তৃণমূলের মানুষের, তাঁর অংশীদারীত্বের কণ্ঠই ধ্বনিত হয়েছিল, 'সুবোধদা, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বড় artist, master artist, কিন্তু বাওনের পোলা — রোমান্টিক। আর আমি তো জাউলার পোলা।' (শান্তনু, ১৯৮৭ : ১০০)

গ্রন্থপঞ্জি

অদ্বৈত মল্লবর্মণ (২০০০)। *অদ্বৈত মল্লবর্মণ রচনাসমগ্র* (সম্পাদক : অচিন্ত্য বিশ্বাস), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

গিয়াস শামীম (২০০২)। *বাংলাদেশের আঞ্চলিক উপন্যাস (১৯৪৭-১৯৮৬)*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

তিতাশ চৌধুরী (২০০১)। *অদ্বৈত মল্লবর্মণ ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা।

দীপেন্দু চক্রবর্তী (১৯৭৮)। 'তারাশঙ্করের সমাজচেতনা ও তাঁর সাফল্য'; *তারাশঙ্কর : দেশ কাল সাহিত্য।* (সম্পাদক : উজ্জ্বলকুমার মজুমদার) কলিকাতা।

বীরেন্দ্র দত্ত (১৯৯৮)। *বাংলা সাহিত্যের একাল*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

রমিত দে (১৪২১)। 'জলের পড়ে থাকা লাশে ঢুকে পড়ে একটি ভিজে অস্তিত্ব'; *কবিতীর্থ* (সম্পাদক–উৎপল ভট্টাচার্য), কলকাতা, পৃ. ১২৬-১৪৫

শান্তনু কায়সার (১৯৮৭)। *অদ্বৈত মল্লবর্মণ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

সত্যেন্দ্রনাথ রায় (২০০৩)। *সাহিত্য সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

সুবোধ চৌধুরী (১৯৯৪)। 'খাঁটি সোনা তাই ভেঙ্গে গেল।' চতুর্থ দুনিয়া (অদ্বৈত মল্লবর্মণ বিশেষ সংখ্যা), কলকাতা। পৃ. ২৩-৩৭।

[প্রবন্ধটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ কর্তৃক ২৯ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে আয়োজিত অদ্বৈত মল্লবর্মণ জন্মশতবার্ষিক সেমিনারে পঠিত]